সৈয়দ মুজতবা আলী ঃ দেশের ম ানুষ, বিশ্বের মানুষ

সুমিতা চক্রবর্তী

সৈয়দ মুজতবা আলীর লেখা থেকেবার বার উঠে আসে সিলেট আর করিমগঞ্জ---- যেখানে তাঁর জন্ম । তাঁরলেখায় মণিখন্ডের মতো জ্বল জ্বল করে বে লপুরের শান্তিনিকেতন--- যেখানেতাঁর শিক্ষা কেবল নয় হয়ত বাতাঁর অন্তরের আলোক - উৎস, তাঁর প্রাণের আরাম। সৈয়দমুজতবা আলীর লেখার পায়ে প ায়ে আমরা ঘুরে আসি কাবুল থেকেজার্মানি---এই যাত্রাপথেই গড়ে উঠেছে তাঁর ব্যক্তিত্বের শিল্পমূর্তি। বাঙালাসাহিত্য এমন শিল্পী সম্ভবত মাত্র দুইজন আছেন--- সৈয়দ মুজতবা আলী আর অমিয় চক্রবর্তী। পর্যটক নন,দুজনকেই বলতে পারি ভ্রামণিক। ভ্রমণ তাঁদের চিত্তবৃত্তির আশ্রয়। প্রকৃত ভ্রামণিকভ্রমণের জন্য ট্যুরিস্ট স্পট খোঁজেন না। বহু দিন ধরে বহু ক্রোশ দূরে, বহু দেশঘুরে যেমন তাঁদের চলা, তেমনই ঘরের পাশের ধানের শিসের শিশিরবিন্দুতেবিম্বিত সূর্যের আলো দেখেও তাঁদের আনন্দ। অমিয় চক্রবর্তী তিন পঙ্‌ক্তিরএকটি ছোটো কবিতায় লিখেছিলেন-----

জগৎযাত্রী,গাছের তলায় বসে
চেয়ে দেখে মাছ ছোটো পুকুরেরজলে----
সারাভুবনের ভ্রমণের মন নিয়ে।।
(গ্রামে ফিরে, চলতি, ঘরেফেরার দিন)

ঠিকএই কথাটিই বলা যায় সৈয়দ মুজতবা আলীর জীবনদৃষ্টি সম্পর্কে। কী নেইতাঁর লেখায় ! পিরপাঞ্জাল-এর বরফে ঠান্ডা করা আঙুরেরগুচ্ছ থেকে করিমগঞ্জের মাটির দাওয়ায় সানকি ভরা পান্তা ভাত। কেনেই তাঁর লেখায় ! জাহাজের সিলেটি খালাসি থেকে হের হিটলার। অথচএই বি - ব্যাপ্তির উপরে যেন বাঙালি মনের সজল, সরস,সবুজ উত্তরীয়টিপেতে দেওয়া হয়েছে।

আর,কী আশ্চর্য ! অমিয় চক্রবর্তী আর সৈয়দ মুজতবাআলী----কারোরই দেশ - ঘর ছিল না কলকাতা -- দিল্লি --মুম্বাই -- চেন্নাই।অমিয় চক্রবর্তী এসেছিলেন অসমের গৌরীপুর থেকে ; আলী সাহেব এসেছিলেনসিলেটের করিম
গঞ্জ(বর্তমানে অসম প্রদেশের কাছাড় জেলার অন্তর্ভুক্ত) থেকে।এবং আরও কী আশ্চর্য ! দুজনেই পৌঁছেছিলেন শান্তিনিকেতনেররবিবৃত্তে। রবীন্দ্রনাথ যেন নিজ মনের মধ্যে ভেঙেছিলেন গ্রাম - দেশের সমস্ত বেড়াকিন্তু বিকে বিম্বিত করেছিলেন সেই বোলপুরের গ্রামটিতে -- যারআসল নামটাই যেন প্রতীকী নাম---ভুবনড াঙা। সেই ভুবনডাঙা থেকেরবীন্দ্রনাথের যে কজন শিষ্য ভুবন - ভ্রমণকেই জীবন করে নিয়েছিলেন তাঁদেরইঅন্যতম দুজন অমিয় চক্রবর্তী আর সৈয়দ মুজতবা অ লী।

পিতারনাম সৈয়দ সিকান্দার আলী। মায়ের নাম আমতুন মান্নান খাতুন। পিতারকর্মস্থল ছিল সিলেট জেলার করিমগঞ্জ শহরে, রেজিস্ট্রেশন বিভাগে।পদস্থ ব্যক্তি ছিলেন তিনি, খান বাহাদুর উপাধি পেয়েছিলেন পরে।করিমগঞ্জেই জন্ম মুজতবা আলীর --১৯০৪ সালের শেষের দিকে।

বাঙালিমুসলমানের মধ্যে যাঁরা শিক্ষিত এবং মধ্যবিত্ত সমাজের মানুষ তাঁরাজন্মসূত্রেই বিরল ধরনের এক ঐশ্বর্য - ঋদ্ধ, সমন্বয়ী সংস্কৃতির উত্তরাধিকারীহয়ে উঠতে পারেন। মাতৃভাষার সূত্রে হিন্দু পুরাণ এবং দর্শনের বিপুল ভান্ডার তাঁদের আয়ত্তেরমধ্যে এসে যায়। নখাগ্রে বিম্বিত হয় রামায়ণ-মহাভারত। আবার পারিবা রিকশিক্ষা ও ধর্মীয় আচরণ-সূত্রে আরবি এবং ফরাসি ভাষায় রচিত সুবিপুলসাহিত্য - সংস্কৃতির প্রাঙ্গণ উন্মুক্ত হয়ে যায় তাঁদের কাছে। মুক্তমনের মুসলমান লেখকদের লেখায় ঝলকায় এক আশ্চর্য ইন্দ্রধনু যা অনেকেই সারা জীবনেওএঁকে তুলতে পারেন না মসীরেখার নক্‌সায়। বাঙলা সাহিত্যে তেমন উদাহরণহ াতের কাছেই আছেন দুজন -- কাজী নজল ইসলাম এবং সৈয়দ মুজতবা আলী।উনবিংশ শতাব্দীর মীর মুশারফ হোসেনের নামও করা যায়। সম্প্রতিক কালেরঅ াবদুল জববার সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ আর আবুল বাশার -এর নাম করাওঅপ্রাসঙ্গিক হবে না। হিন্দু বাঙালি লেখকদের ক্ষেত্রে এটা কম হয়। কারণসাধারণত তাঁর া ইসলাম ধর্মের বই পত্রের হদিশ রাখেন না।

মুজতবাআলী সাহিত্যের টান জেনেছিলেন ছাত্র বয়সেই। ওমর খৈয়াম -এর বাইয়াৎ পড়লেনসেই সাহিত্যপ্রীতি থেকে। তখন সবে মাত্র প্রকাশিত হয়েছেকান্তিচন্দ্র ঘোষের করা ওমর খৈয়াম -এর কবিতার অনুবাদেরসংকলনটি--- প্রথম চৌধুরীর ভূমিকা সহ। মুগ্ধ হয়ে গেলেন তিনি। মনোবৃত্তেস্থান করে নিলেন প্রথম চৌধুরীও। সৈয়দ মুজতবা আলীর লিখনকর্মে যেদুজন বাঙালি হৃদয়, মনন এবং শিল্প - শৈলীর প্রতিসরণ লক্ষ করাযায় -- তাঁরা রবীন্দ্রনাথ আর প্রমথ চৌধুরী।

অতঃপরসৈয়দ মুজতবা আলীর মধ্যম অগ্রজ ভ্রাতা সৈয়দ মূর্তাজা আলী লিখেছেন----মুজতবাআলীর ঝোঁক চাপল বাইয়াতের বিভিন্ন বাংলা ও ইংরাজী অনুবাদ

সংগ্রহকরার দিকে। সে ফিটজেরাল্ডের অনুবাদের বিভিন্ন সংস্করণ,উইন্ডফিল্ডের অনুবাদ, সত্যেন দত্ত ও কান্তি ঘোষের অনুবাদ সংগ্রহকরে গভীর মনোযোগের সঙ্গে পড়ত। পরবর্ত্তী জীবনে নজল ইসলামেরবাইয়াতের অনুবাদের গভীর মনোযোগের সঙ্গে পড়ত। পরবর্ত্তী জীবনে নজলইসলামের বাইয়াতের অনুবাদের এক পান্ডিত্যপূর্ণ ও সরস ভূমিকা লেখে।(ভূমিকা পৃ. ক. সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী প্রথম খন্ড, মিত্র ওঘোষ. প্রথম প্রকাশ ১৩৮১, সপ্তম মুদ্রণ ১৪০৩)। এই উদ্ধৃতি থেকেআমরা বুঝতে পারি স্কুলের ছাত্র থাকার সময় থেকেই মুজতবা আলী কেবলসাহিত্য অনুরাগী নন, হয়ে উঠেছিলেন একজন সাহিত্য - গবেষক। এই আর একধরনের বিরল সংঘে ঘটেছিল তাঁর মননে। সরস মনের এবং স্বচ্ছ জীবনবোধের সঙ্গে বিজ্ঞানআর মনীষার সমন্বয়ে তাঁর ব্যক্তিত্ব সমুজ্জ্বল। এখানেও তাঁর পূর্বসূরী প্রথমচৌধুরী। তবে যে হৃদয়ের সজলতা এবং অনুভবের স্নিগ্ধতা মুজতবা আলীর লেখায়পাই তা প্রথম চৌধুরীর ব্যক্তিত্বে ততটা ছিল না।

অসহযোগআন্দোলন বাঁধভাঙা হয়ে উঠল ১৯২০ -২১ সাল থেকে। মুজতবা আলী তখন সিলেটেরসরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির ছাত্র। প্রথম হওয়া ছাত্র, কিন্তু নেমেপড়লেন ধর্মঘটে। পিতা সরকারি কর্মী। চাপ এল উপর- মহল থেকে ।কিন্তুপিতার নির্দেশ অমান্য করলেন মুজতবা, স্কুলে ফিরে যেতে রাজি হলেন না।

তারআগে ১৯১৯ সালে রবীন্দ্রনাথ সিলেটে এসেছিলেন এবং একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন ছাত্রদের কাছে। বিষয় ছিল আকাঙক্ষা। চোদ্দো বছরের কিশোর মুজতবা আলী সকলকে গোপন করে একটি চিঠিলিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথকে। জানতে চেয়েছিলেন কেমন করে আকাঙক্ষাকে মহৎকরে তুলতে হয়। সে চিঠির উত্তরও এসেছিল আশমানি রঙের খামে ওই রঙেরই কাগজে। অপ্রত্যাশিতসেই পত্র আলী পরিবারে বেশ আলোড়ন তোলে এবং মুজতবার মনে জাগায়রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা এবং আগ্রহ। আমাদের মনে পড়ে যায়, স্কুলের ছাত্রঅমিয় চক্রবর্তী প্রথমে ঘরে-বাইরে পাঠ করে তারপর আগ্রজেরমৃত্যুতে শোকাচ্ছন্ন হয়ে লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথকে।

সিলেটেরউত্তপ্ত রাজনৈতিক আবহ থেকে তাঁর পিতা যখন পুত্রকে সরিয়ে নেবার কথাভাবলেন তখন মুজতবা নিজেই শান্তিনিকেতনে যাবার ইচ্ছে প্রকাশকরেন। তখন বিশ্বভারতী একটি বিশ্ববিদ্যালয় রূপে সবে মাত্র স্থাপিতহয়েছে ১৯১৮ সালে তিনি বিশ্বভারতীর কলেজ বিভাগে যোগ দিলেন বহিরাগত ছাত্রহিসাবে। রবীন্দ্রনাথ নিজেই তখন শিক্ষক। বাঙলা এবং ইংরেজি কাব্য-কবিতাতাঁর কাছে পড়েছিলেন মুজতবা আলী। বিশ্বভারতীর একেবারে প্রথমযুগের স্নাতক তিনি। তারপরে কিছুদিন তিনি আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়েওপড়েছিলেন।

জীবিকাসন্ধানের পালা যখন এল তখন হঠাৎ তিনি সুযোগ পেয়ে গেলেন আফগানিস্থানেরশিক্ষা বিভাগে অধ্যাপনা করবার। এই সুযোগের মূলেও ছিলশান্তিনিকেতনের সংযোগ। শান্তিনিকেতনে তখন ছিলেন ফরাসি অধ্যাপকএফ. বেনোয়া এবং শ অধ্যাপক বগদানভ। এই দুজনেই যোগ দিয়েছিলেন আফগানিস্তানের শিক্ষা - বিভাগে। তখনআফগানিস্তানের শাসক আমানুল্লা খান্। পাশ্চাত্য শিক্ষায়সুশিক্ষিত, আধুনিক মনোভাব সম্পন্ন আমানুল্লা খান্ আফগানিস্তানকেএকটি প্রগতিশীল আধুনিক রাষ্ট্রে পরিণত করতে চেয়েছিলেন।ফলে ব্যাপক শিক্ষা - সংস্কার শু করেছিলেন দেশ জুড়ে, বিশ্বের বিভিন্নপ্রান্ত থেকে নিয়ে গিয়েছিলেন অধ্যাপকদের। এই দুই পূর্বপরিচিত অধ্যাপকের সাহায্যেই বিশ্বভারতীর তণ স্নাতক সৈয়দ মুজতবা আলীকাবুলে গিয়ে সে দেশের শিক্ষা বিভাগে যোগ দেন। তিনি পড়াতেনকৃষিবিজ্ঞান মহাবিদ্যালয়ে মানবিকীবিষয় সমূহ। এ ঘটনা ১৯২৭ সালেরমাঝামাঝি। দু-বছর কাবুলে থেকে ১৯২৯ সালের মাঝামাঝি তাঁকে দেশে ফিরে আসতেহয়। আমানুল্লা খান্ তখন ক্ষমতাচ্যুত। মৌলবাদী বাচ্চাই সকাও তখনকাবুলের বাদশা। শিক্ষা - সংস্কার বন্ধ। যথেষ্ট ঝুঁকি নিয়েই দেশেফিরে আসতে হয় তাঁকে।

এদেশেএসে কর্ম - সংস্থান করা কিন্তু একটু সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। বিশ্বভারতীয়ডিগ্রি ব্রিটিশ সরকারের কাছে স্বীকৃত ছিল না তখনও । মুজতবা বিদেশে গিয়েঅধ্যয়ন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ব্রিটিশ - শাসিত কোনো দেশেই বা খোদব্রিটেনে বিশ্বভারতী প্রদত্ত ডিগ্রি নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভরতি হওয়া সম্ভবছিল না। যে - কোনো দেশের স্বদেশীয় শিক্ষা- প্রতিষ্ঠানকেস্বীকৃতি দিত জার্মানি। একদিকে প্রথম মহাযুদ্ধে ব্রিটেনের কাছে পরাজিতজার্মানির প্রশাসন ব্রিটিশ নিয়মাবলি অনুসরণ করা আবশ্যিক মনে করেনি।দ্বিতীয়ত জার্মানিতে তখন স্বাদেশিকতারপ্রতি, জাতীয়তাবাদের প্রতি সমর্থন ক্রমশ উগ্রতর হতে শু করেছে।মুজতবা আলী জার্মানির উইলহেল্ম হুমবোল্টনামক শিক্ষা -প্রতিষ্ঠান থেকে একটি মাসিক বৃত্তি লাভ করেন এবং ১৯২৯ সালেইজার্মানি চলে যান, তিনি প্রথমে জার্মানির বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভরতিহলেন। কিছুকাল পরে বার্লিন ছেড়ে জার্মানির বন বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিলেন এবংঅর্জন করলেন পি-এইচ. ডি. উপাধি। সময়টি ১৯৩২। তাঁর গবেষণার বিষয়ছিল--- খোজা সম্প্রদায়ের উদ্ভব এবং তাদের বর্তমান ধর্মীয় জীবন (The origin of the Khozhas and their religious lifeto – day' । তিনি দেশে
শফিরে অসেন ১৯৩২-এ। সৈয়দ মুজতবা আলীর জীবনে অত্যন্ত গুত্বপূর্ণ একটিস্থান অধিকার করে আছে প্রাক্ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের জার্মানি। তাঁরসাহিত্যকর্মের একটি প্রধান পটভূমি জার্মানির বিভিন্ন অঞ্চল (শহর ওগ্রাম) এবং তাঁর লেখার একটি প্রধান উপকরণ জার্মান সংস্কৃতি।হিটলার - কে নিয়ে একটি বই লিখেছিলেন তিনি। যে কারণে অনেকে তাঁকেফ্যাসিবাদ সমর্থক, বিশেষ করে হিটলার সমর্থক মনে করেছেন। এই বিষয়টিরআলোচনায় আমরা পরে প্রবেশ করব।

মুজতবাআলী জার্মানি থেকে ফিরে আসেন ১৯৩২ সালে। অল্প কিছুকাল পরে ১৯৩৪-এআবার চলে যান জার্মানিও ইউরোপের অন্যান্য দেশে। তখনই তাঁর মনের ধর্মহয়ে উঠেছে রবীন্দ্রনাথের সেই গান। তিনি তখন থেকে সুদূরের পিয়াসী----ওগো সুদূর, বিপুল সুদূর--- তুমি যে বাজাও ব্যাকুল বাঁশরি। মানুষের যে ডানানেই তা নিয়ে দুঃক না করে সৈয়দ মূজতবা আলী জলযান এবং আকাশ যানকেইবিকল্প বেছে নিয়ে সেই বাঁশির টানে ঘর ও বাহির করেছিলেন সারা জীবন।

আবারতিনি চলে গেলেন ইউরোপ। সেখান থেকে মিশরের কায়রো শহরেরসুপরিচিত আল-আজহর বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুকাল লেখাপড়া করেন। এখানেও সৈয়দমুজতবা আলীর সঙ্গে অমিয় চক্রবর্তীরমিল। তাঁদের দুজনের কাছেই সুদূরের আহ্বান কেবল ভূগোলের দেশ থেকেআসেনি, এসেছিল মানব সভ্যতায় দীর্ঘকাল ধরে সঞ্চিত সংস্কৃতির দেশ থেকেও অমিয়চক্রবর্তীর প্যালেস্টাইন ভ্রমণ স্মর্তব্য।

বরোদারমহারাজা সয়াজিরাও গাইকোয়াড় আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করতেগিয়েছিলেন তিরিশের দশকের শেষের দিকে। তিনি মুগ্ধ হলেন সৈয়দ

মূজতবাআলীর পান্ডিত্যে ও ব্যক্তিত্বে। তাঁকেআমন্ত্রণ জানিয়ে এলেন স্বদেশে। দেশে ফিরেমুজতবা আলী বরোদায় গেলে তখনই মহারাজা তাঁকে বরোদা মহা বিদ্যালয়েরঅধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন। আট বছর সেই পদে থেকে, মহারাজের মৃত্যুর পরতিনি কলকাতায় চলে আসেন। বারোদায় থাকাকালীন আরবি ভাষায়গুজর াটের একটি ইতিহাস সম্পাদনা করতে শু করেছিলেন তিনি। সে কাজশেষ করতে পারেননি।

কলকাতায়এসে তিনি প্রথমেই চলে আসেন তাঁর বন্ধু আবু সয়ীদ আইয়ুবের কাছে।তাঁর সাহচর্যেই বাস করেন দীর্ঘকাল । রোগাক্রান্ত আইয়ুবদক্ষিণভারতের মদন াপল্লীতে গেলে মুজতবা আলীও তাঁর সঙ্গে যান। তখন তিনিকিছুকাল বাঙ্গালোরে বসবাস করেন।

ভারতস্বাধীন হল। সৈয়দ মুজতবা আলী বগুড়া কলেজের অধ্যক্ষ রূপে কাজে যোগদানকরেন ১৯৪৯ সালে। কিন্তু প্রথম থেকেই পূর্ব পাকিস্থানেররাষ্ট্রীয় প্রশাসন তাঁর প্রতি অপ্রসন্ন ছিল। পূর্ব পাকিস্তানেররাষ্ট্রভাষা সম্পর্কিত একটি পুস্তিকা তিনি প্রণয়নকরেছিলেন যেখানে বাঙলা ভাষাকে সমর্থন জানাবার জন্য তিনিপ্রশাসন-কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হন। যদিও ১৯৫১ সালে রাবেয়াখাতুনের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। তবু পূর্ব বাঙালায় তিনি থাকতে পারেননি,ভারতের নাগরিকত্ব গ্রহণ করে এদেশে চলে আসেন। রাবেয়া খাতুন অত্যন্তসুশিক্ষিত এবং কর্মক্ষেত্রে উচ্চ সরকারি পদাধিকারী ছিলেন। তাঁদেরদুই পুত্রও সুশিক্ষিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত। তাঁরা পুর্ব বাঙলায়থেকে যান এবং পরবর্তীকালে ও বর্তমানে তাঁরা স্বাধীন বাংলাদেশের নাগরিক।

দেশেফিরে এসে সৈয়দ মুজতবা আলী প্রথমে ভারত সরকারের সাংস্কৃতিকসংযোগ (Cultural Relation) বিভাগেরসেক্রেটারি পদে যোগ দেন। তারপর ভারতীয় বেতার বিভাগে যোগদান করেন।প্রথমে ছিলেন অল ইন্ডিয়া রেডিয়োর কটক স্টেশন-এর অধিকর্তা।ত ারপর চলে যান যথাক্রমে পাটনা এবং দিল্লিতে। সেখানেও ছিলেন বেতারবিভাগের সঙ্গে যুক্ত। শেষ পর্যন্ত আবার শান্তিনিকেতনে ফিরে এসেতিনি জার্মান ভাষার অধ্যাপনা শু করেন। পরে ৰিভারতীর ইসলামীয়সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। একেবারে শেষ জীবনে আবার কলকাতায়দিনযাপন করেছিলেন।

সৈয়দমুজতবা আলীর লিখন কর্মের শু মোটামুটি পরিণত বয়সেই হয়েছিল।মোহম্মদী পত্রিকায় ১৯৩৫ সালে মিশরের শিক্ষায়তন বিষয়ে একটিপ্রবন্ধের প্রকাশই সম্ভবত তাঁর প্রথম দিকের লেখা হিসেবেসকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তারপরই দ্রুত তিনি লেখার জগতেপরিচিত হয়ে ওঠেন তাঁর সরস প্রবন্ধজাতীয় রচন াগুলির জন্য।সিলেট শহরে মুসলিম সাহিত্য সংসদের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনে তিনি সভাপতিত্বকরেন। তাঁর লেখার মধ্যে উচ্চমানের ফিচারের সমস্ত গুণ বর্তম ানথাকায় দৈনিক সংবাদপত্রে কলাম লেখার আমন্ত্রণ তাঁর কাছে আসে। আনন্দবাজারপত্রিকায় সত্যপীর এবং টেকচাঁদ নামে তিনি কলাম লিখেছেন। রায় পিথৌর ানামে লিখেছেন হিন্দুস্তান স্টান্ডার্ড পত্রিকায়। ১৯৪৮ সালে দেশ পত্রিকায় দেশে - বিদেশে লিখতে শু করার সঙ্গে সঙ্গেই বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেনতিনি।

সুপন্ডিত এবং বহুভাষাবিদ্ সৈয়দ মুজতবা আলীর লেখক পরিচয়টি সহজে উদ্ঘাটিত করা সম্ভবনয়। প্রগাঢ় পান্ডিত্য, অতি বিরল রসদৃষ্টি, তীক্ষ্নপর্যবেক্ষণ - শক্তি এবং অত্যন্ত বিরল ধরনের জীবন - রসবোধের সমন্বয়ঘটেছিল তাঁর চিত্তে। তিনি লিখতেনপ্রধানত ফিচার জাতীয় লেখা। কিন্তু সে লেখার মনীষা এবং সা হিত্যগুণএত স্বতন্ত্র, এত ব্যতিক্রমী এবং এত দূরপ্রসারী যে সেগুলিকে কোনোনির্দিষ্ট নামে চিহ্নিত করা প্রায় অসম্ভব। তাঁর গল্প আরফিচার প্রায়শই একত্রে মিলে য ায়, তাঁর ভ্রমন কাহিনী আর উপন্যাসকেআলাদা করা দুরূহ তাঁর ফিচারগুলি একই সঙ্গে ইতিহাস, ভাষাতত্ত্ব,বিদেশ-বিবরণ আর জীবনের হাসি অশ্রুকে সংশ্লেষিত করা কাব্য। প্রতিটিলেখাতেই তিনি স্বয়ং নায়ক। তাঁর চোখ দিয়ে না দেখলে, তাঁর মন দিয়ে নাবুঝলে সেই সব দেশ, সমাজ, মানুষকে বোঝা যাবে ন া। তিনি একজন নিরবচ্ছিন্নগবেষক। তাঁর গবেষণার বিষয় হতে পারে জার্মান ভাষার ব্যাকরণ, স্যালাডসাজাবার কৌশল, জাহাজ মাজি-মাল্লা সারেং - ক্যাপ্টেনের জীবন অথবারবীন্দ্রনাথের গান। ৰি - সংস্কৃতির হেন বিষয় নেই যা নিয়ে তিনি না লিখতেপারেন এবং তাঁর কোনো একটি লেখাও এমন নয়—যাকে না বলতে পারি ৰি - সংস্কৃতির দর্পণ।

তিনি লিখেছেন ভ্রমণ-বিষয়ক অনেকগুলি লেখা দেশে - বিদেশে, ভবঘুরে,জলে-ডাঙায় ইত্যাদি। এগুলির মধ্যেইমিশে আছে এক - একটি ছোটো গল্প।বৈঠকি রীতির ছোটো গল্প চাচা কাহিনী তাঁর অন্যতম পরিচিতসংকলন। দু-হারা, শবনম, শহর-ইয়ার ইত্যাদি উপন্যাস লিখেছেন তিনি। লিখেছেনপঞ্চতন্ত্র নামের গবেষণা - ফিচার। এছাড়া লিখেছেন এই ধরনের বহু সংমিশ্রিতলেখা, তাদের সংরূপ - লক্ষণকে এখনও কোনো সমালোচক নির্দিষ্টকরেননি। তাঁর লেখায় বৈঠকি খোস গল্পের ধরনটি সর্বদাই যেন জীবন্তহয়ে, হাত-পা নেড়ে, অথবা তামাক বাচুট টানতে টানতে আমাদের সামনে তাঁর বাচনকে মূর্ত করে তোলে।কোনো একটি লেখ ায় — যদি সে লেখা সাময়িক পত্রের জন্য একটি পরিমিতপ্রবন্ধহয়, তার মধ্যে দিয়ে তাঁকে হাজির করা কিছুতেই সম্ভব নয়।সুবিধে এই — তা করবার দরকার ও পড়ে না। কোন্ শিক্ষিত বাঙালি নাপড়েছেন দেশে - বিদেশে আর পঞ্চতন্ত্র ? আমরা এই লেখায় তুলে ধরব তাঁর একটি মাত্র রচনাকে। সেলেখাটি মনে হয় বহুল পরিচিত নয়। সে লেখাটির নাম হিটলার।

প্রসঙ্গত একটি কথা মনে এল। হিটলারকেঅবলম্বন করে সম্পূর্ণ একটি বই লিখে উঠেছেন বলে কারও কারও মুখে এমন কথাওশুনেছি—হিটলারের সমর্থক ছিলেন সৈয়দ মুজতবা আলী। হিটলারের প্রতিসমর্থন কোনো স্বাভাবিক মানুষ জানাতে পারেন না—কাজেই ওই অসম্ভবঅভিযোগের উত্তর দেবার চেষ্টা না করে বরং ভাবা যাক সত্যিই কেনহিটলারকে নিয়ে সম্পূর্ণ একটি বই লেখা ? এরকম কাজ কোনো বাঙালি লেখককেকরতে দেখিনি আমরা, তা হলে কেন তা করলেন সৈয়দ মুজতবা আলী ? এর কারণ কেবল অনুমানই করা যায়। আমাদের অনুমান ব্যক্ত করছি এখানে। এই কাজটি তাঁকে করতেই হল কারণতিনি বিশ্বের মানুষ। নিজের ঘোষণার জোরে নয়, স্তাবক- বন্ধুদেরপ্রচারের জোরে নয়, অন্তরের ধর্মে। আর বিংশ শতাব্দের বিশ্বেরএক ভয়ংকর, আন্তর্জাতিক ঘটনার নাম অ্যাডলফ্ হিটলার।

সৈয়দ মুজতবা আলীর মনের রসায়নে স্বচ্ছমনীষার বৈজ্ঞানিক নিরপেক্ষতা আর হৃদয়াবেগের সজল তারল্য মিশে আছে।যদি ব্যক্তিগতভাবে আমার মত জানতে চ াওয়া হয়, আমি সেলাম দেব ওই মনীষারমননদীপ্ত চিন্তককে। তাঁর নখ দর্পণে ছিল বিশ শতকীয় সভ্যতার সমস্তদিক --- রাজনীতি, সমাজনীতি, শোষণনীতি, দমননীতি, বাণিজ্যনীতি আরহৃদয়নীতি---- সব কিছু সহ। এই বিশ শতককে তিনি চিরে বিশ্লেষণ করেছেনতাঁর প্রতিটি লেখায়। দেশ-গাঁয়ের পুকুরঘাটের কথা যখন তখন বলতেভোলেননি যে, সেই ঘাট বাঁধানোর পয়সা এসেছে দেশের ছেলেটির বিদেশে থাকারোজগারেরঅংশ থেকে। যখন জার্মানির রেস্টুরেন্ট ও জার্মানির ক্লাবের কথা লিখেছেন,সেখানে তাঁর দেশ - ঘরের মানুষ কেমন করে আড্ডা জমায়, আর কেমন করে,প্রবাসী বাঙালী জার্মান পরিবারের গৃহকর্ত্রীর মুখে খুঁজে

পায় নিজেরমায়ের মুখের প্রতিচ্ছায়া তা-ও দেখিয়েছেন। কিন্তু বিশ শতকের চরিত্র যেএই আন্তঃরাষ্ট্রিকতা তার মূলে আছে বিংশ শতাব্দীর কয়েকটিঘটনা আর কয়েকজন মানুষ। সেই ঘটনাগুলির মধ্যে প্রধান দুটি ঘটনাঅবশ্যই দুটি বিশ্বযুদ্ধ। দুই বিশ্বযুদ্ধেই অপরিহার্য নাম জার্মানি। দ্বিতীয়বিশ্বযুদ্ধে সেই জার্মানি আর হিটলার অবিচ্ছেদ্য । হিটলার কে না জানলে কি জানাযাবে বিশ শতকের বিশ্বকে ? এ কোনো ব্যক্তিগত ভালো-লাগা মন্দ-লাগারব্যাপার নয়। হিটলারের চরিত্রের উপাদানগুলির চারিত্রে উপাদানগুলির মধ্যে নিহিত আছেবিংশ শতাব্দীর রাষ্ট্রীয় ভাবনার সমস্ত বিষ, সমস্ত অহংকার,সমস্ত ভ্রান্তি। বিংশ শতাব্দীর সাম্রাজ্যবাদী, পণ্যবাদী, দম্ভ - স্ফীত,আত্মসর্বস্ব রাষ্ট্র ও সমাজ বিন্যাসের অনু - পরমাণুগুলি কমবেশি মিশেআছে প্রতিটি রাষ্টযন্ত্রের চালকদের চরিত্রে। হিটলারের চরিত্রেজমে উঠেছিল প্রতিটি উপাদানের সর্বাধিক ঘনত্বের নির্যাস। সেই অর্থেহিটলার আধুনিক সভ্যতার অশুভ শক্তির, অশুভ ভাবনার ঘোলাটে বিভ্রমেরপ্রতীক হয়ে দাঁড়ান। তাই বিংশ শতাব্দের বিশ্বকে যাঁরা জানতে চাইবেনতাঁদের জানতে হবে হিটলারকে। সেই সঙ্গে লেনিন, স্তালিন, মুসোলিনি,চার্চিল, জভেল্ট, গান্ধি, পিকাসো, ইদি আমিন, মাও-সে তুঙ, হো চি মিন,ম্যান্ডেলাকে। এই মিশ্রণটাই বিংশ শতাব্দী।

সেই জার্মানিতে, যখন একবার নয়, বার বারযাবার সুযোগ ঘটল সৈয়দ মুজতবা আলীর, হিটলারের ক্ষমতায়অধিষ্ঠিত হবার ঠিক প্রাক্ - কালে, তাঁর ক্ষমতা দখলের ঠিকপরের বছর, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঠিক আগের বছর যখন জার্মানিতে যাবার সুযোগঘটলই তাঁর -তখন কেন তিনি সেই সুযোগকে কাজে লাগাবেন না ? এভাবেই হিটলার সম্পর্কিত বই লেখা। বিশ্বচেতনার দাবিতে, ইতিহাসের অঙ্গুলি- হেলনকে বুঝে নেবার টানে। ইতিহাসকে কেবল তার সুফল দিয়ে নয়, কুফলদিয়েও চিনতে হয়।

মুজতবা আলী প্রথম বার জার্মানিগিয়েছিলেন ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে ---হিটলার তখনও জার্মানিতে সুপরিচিত নন।তিনি দেশে ফিরলেন ১৯৩২ -এ, ১৯৩৩ হিটলার জার্মানির চ্যান্সেলার হলেন। একবছরের জন্য ১৯৩৪ সালে আবারতিনি জার্মানি গেলেন। মুজতবা আলী লিখেছেন---তখনহিটলার কিভাবে রাজ্য শাসন করেন সেটি পুরোপুরি দেখলুম। আরার ১৯৩৮সালে চার মাসের জন্য তাঁর জার্মানি যাওয়া। যুদ্ধের পরেও তিনি দুবারজার্মানি গিয়েছিলেন। কোন্ মনীষাসম্পন্ন ব্যক্তি এই পরিস্থিতিতে নিজেরঅভিজ্ঞতাকে লিখিত রূপে স্থায়িত্ব দিতে না চাইবেন ! মুজতবা আলী লিখেছেন---বিশ্বযুদ্ধের পর তিনি হিটলার সম্পর্কে শত শত বইকিনেছিলেন।

ইতিহাসের পাঠক মাত্রেই জানেন এমন গবেষক মাঝে মাঝেই দেখা দেনযাঁরা কোনো এক জন ইতিহাস - প্রসিদ্ধ ব্যক্তিসম্পর্কে বিশেষ আগ্রহ ওআকর্ষণ বোধ করতে থাকেন। আলেকজান্ডারকে নিয়ে, নেপোলিয়নকে নিয়ে,আকবরকে নিয়ে, রবীন্দ্রনাথ বা বিদ্যাসাগরকে নিয়ে এমন ছোট ও বড় গবেষকের সন্ধান আমরা পেয়েছি। হিটলারকে নিয়েও বহু অনুসন্ধান, বহু গবেষণাহয়েছে। লেখা হয়েছে বহু স্মৃতিকথা, বহু গ্রন্থ। সৈয়দ মুজতবা আলীহিটলার সম্পর্কিত কোনো তথ্যই নিজে আবিষ্কার করেননি। বঙ্গ সন্তানেরপক্ষে তা সম্ভবও ছিল না। কিন্তু তিনি বহু প্রামাণ্য গ্রন্থের সহায়তানিয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন সংস্কৃতির এক ঔপনিবেশিক দেশের মানুষের চোখ দিয়ে সেইআশ্চর্য মানুষটিকে দেখার চেষ্টা করেছিলেন। বাঙালি পাঠকের জন্য তিনি রেখে গেছেন তাঁর নিজস্ব ধারণার নিষ্কাশিতফসল।

পাঠক মাত্রেই লক্ষ করবেন মুজতবা আলীরঅনবদ্য সরসতা এই লেখাটিতে ততটা অনুভূত নয়। আবার সাধারণ বাঙালিলেখকদের মতো প্রতিপদে ফ্যাসিস্ট হিটলার, নরদানব হিটলারইত্যাদি ভাষা ব্যবহার করে বালখিল্য উত্তেজনা ছড়াবার চেষ্টাও তিনিকরেননি। তাঁর ভাষা অনুত্তেজিত, শান্ত ঈষৎ পাথুরে এবং পক্ষপাত - বিহীন। যেন অনেকটা যন্ত্রের চোখ, যেন যন্ত্রের নথি করণ। তাঁর ভাষা থেকেএটাও উঠে আসে--- যে কথা ১৯৪০ সালে লিখিত সংবর্ত কবিতায় লিখেছিলেনসুধীন্দ্রনাথ দত্ত----

অথচ প্রত্যহ শুনি চার্চিলের স্বেচ্ছাচার বিনা
অসাধ্য সাম্রাজ্যরক্ষা, অব্যর্থ প্রলয়,
এবং যে-ব্যক্তিস্বত্ব সভতার সম্মত আশ্রয়,
তারও অব্যাহতি নেই অপঘাত থেকে
একা হিট লারের নিন্দা সাধে আজ বাধে কিবিবেকে ?

বিংশ শতাব্দের সভ্যতায় রাষ্ট্রব্যবস্থার যে স্বরূপ ছিল তা অনেকটা উন্মোচিত হয়ে যায়হিটলারের জীবন ও কর্মের প্রতিবেদন থেকে। সেই কাজটাই করেছিলেনমূজতবা আলী।

উৎস -গ্রন্থ হিসেবে কয়েকটি বইয়েরনাম তিনি বিশেষভাবে করেছেন। তার মধ্যে প্রধান হল ১৯৪৭ সালেপ্রকাশিত লাস্ট ডেজ অফ হিটলার। ভূপৃষ্ঠ থেকে অনেক অনেকগভীর নীচে পঞ্চাশ ফুট কংক্রিটের ছাতের তলায় তৈরি হয় বাংকারযেখানে কামান বা এরোপ্লেন থেকে নিক্ষিপ্ত গোলা পৌঁছতে পারে না।সেইখানে হিটলার পিস্তলেরগুলিতে আত্মহত্যা করেন। পাশে ছিলেন তিন দিন আগে পরিণীতা, কিন্তু পনেরো বছরের বান্ধবী এফা ব্রাউন।তিনি আত্মহত্যা করেন বিষ খেয়ে। কিন্তু হিটলারের মৃত্যু সম্পর্কে তদন্তকরার ভার দেওয়া হয় ইতিহাসের অধ্যাপকএবং যুদ্ধকালীন গুপ্তচরবিভাগের উচ্চ পদাধিকারী কর্মী ট্রেভর রোপার-কে। তিনি হিটলারেরশেষ মুহূর্তের সঙ্গে যাঁরা ছিলেন যাঁরা তাঁকে শেষ মুহূর্তেও এক ঝলকদেখেছিলেন---- যেমন বাগানের মালি, রাঁধুনি, কোনো কোনো প্রহরী,তাঁর অনুচরদের পত্নীরা--- যত জনের সঙ্গে সম্ভব কথা বলে সাত মাস পরেতাঁর প্রতিবেদন জমা দেন। সেইপ্রতিবেদন প্রকাশিত হয় তারপরআরও কিছু কিছু তথ্য উদঘাটিত হয়। এইসব মিলিয়েই রচিত হয় রোপার-এর ওই গ্রন্থ লাস্ট ডেজ অফ হিটলার। তারপরে আরও অনেক লেখালিখিবেরিয়েছে এই বিষয়ে। কিন্তু অধ্যাপকরোপার-এর- বর্ণনার সঙ্গে মূলগত পার্থক্য তেমনভাবে কোথাও দেখা যায়না।যুদ্ধের পর দশ বছর কারাবাস করে ১৯৫৫ সালে রাশিয়ার জেল থেকে মুক্তিপেয়েছিলেন হিটলারের কয়েক জন সঙ্গী। তাঁদের মধ্যে ছিলেন তাঁর নিজস্বপরিচারক বা ভ্যালে এবং নিজস্ব পর্যটক। তাঁরাও এ বিষয়ে বিবৃতি দিয়েছিলেন। সেগুলিরমধ্যেও পরস্পর বিরোধিতা কম। কাজেই মুজতবা আলী কোথা থেকে তাঁররচনার উপাদান পেয়েছিলেন তা তিনি স্পষ্ট করেই লিখে রেখে গেছেনআমাদের জন্য।

সৈয়দ মুজতবা আলীর লিখন শৈলীর সুরথেকেই তাঁর একদিকে নিরপেক্ষ, অন্য দিকে বিশ্ব পরিস্থিতি সম্পর্কেতাঁ
হবার এক বছর আগে ইউরোপেরপরিস্থিতি কয়েকটি মাত্র ছাত্রে ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন-----

১৯৩৩-এ হিটলার চ্যানসেলর হলেন। ১৯৩৪-এজর্মনির প্রেসিডেন্ট হিন্ডেনবুর্গ মারা গেলে তিনি সে আসনটিও দখল করেদেশের ফ্যুরার বা একচ্ছত্রাধিপতি নেতা হন। পার্লামেন্টের আর কোনোস্বাধীনতা রইল না। ১৯৩৮-এ হিটলার স্বাধীন অষ্ট্রিয়া রাজ্য(তাঁর আপন জন্মভূমি ওই দেশেই) দখল করে বৃহত্তর র াইযেরঅংশ করে নিলেন। ওই বছরের সেপ্টেম্বরেই তিনি চেকোশ্লোভাকিয়ারজর্মান - ভাষাভাষী অঞ্চল গ্রাস করতে চাইলে শান্তি ভঙ্গের ভয়েভীতইংলন্ডের চেম্ব ারলেন ও ফ্রান্সের দালাদিয়ে সে অঞ্চলটুকু তাঁকে লিখিত -পঠিত ভাবে দান করলেন। কয়েক মাস পরে হিটলার চেকোশ্লোভাকিয়ার যেঅঞ্চল তিনি স্বাধীনভাবে ছেড়ে দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলেন সেইটুকুওকাউ কেকিছু না বলে - কয়ে গ্রাস করলেন। তখন চেম্বারলেনের কানে জল গেল--- সেওপূর্ণমাত্রায় নয়। ১৯৩৯-এ হিটলার পোলান্ডের ভিতর দিয়ে জর্মন পূর্বপ্রাশা সংযুক্ত করার মানসে পোলান্ডরাজ্যের কাছে করিডর এবং অন্যান্যএটাসেটা দাবী করলেন। ইতিপূর্বেই জর্মন তথা ঋিবাসীকে সচকিতশঙ্কিত করে তিনি তাঁর জাত শত্রু স্তালিনেরসঙ্গে চুক্তি করেপোলান্ড ভাগাভাগি করে নিয়েছিলেন।

এই অংশটি থেকে বোঝা যায় যে হিটলারেরভিন্ন দেশ গ্রাস করে নেবার অসংগত বাসনাকে যেমন যথাযথভাবে তুলে ধরেছেন. তেমনই দেখিয়ে দিয়েছেন যে যতক্ষণ না নিজেদের স্বার্থে বড় রকমের আঘাত দেখাদিচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স হিটলারের এই ভিন্নরাজ্যগ্রাসের ব্যাপারটিকে উপেক্ষা করতেই চেয়েছিল।

হিটলারের চরিত্রের গভীরে যতইপ্রবেশ করা যায় ততই দেখা যায় যে তিনি খুব সুস্থ ও স্বাভাবিকমস্তিষ্কের মানুষ ছিলেন না। তাঁর আত্মপ্রাধান্য বোধের যে মাত্রা ছিল,জার্মান জাতির শ্রেষ্ঠতা সম্পর্কে যে ধরনের ঋিাস ছিল---তাকেবাস্তববোধ বিচ্ছিন্ন এবং উন্মত্তবৎ বলাটা ভুল নয়। হিটলারেরপাশাপাশি যে মন্ত্রী - সেনাপতির া ছিলেন তাঁরা ফ্যাসিবাদের নীতিতে ঋিাসকরতেন একথাও যেমন সত্য----তেমনই সত্য যে ক্বচিৎ কখনও তাঁরাবাস্তবোচিত পরামর্শ দিলেও হিটলার তা গ্রাহ্য করতেন না। অধিকপরামর্শ দিতে গেলে পরামর্শদাতার প্রণদন্ডের আদেশ দিতে তাঁর মুহূর্তেমাত্র দেরি হত না। হিটলারের জীবনী- লেখকদের অনুসরণে মুজতাব আলী লিখেছেন---হিটলারের মেজাজটি ছিল আগুনে গড়া। দুঃসংবাদ পেলেই চিৎকার করেউঠতেন কর্কশ কণ্ঠে, চিৎকারে তাঁর গাল ফেটে যেত,পাইচারি না -- -ঘরের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত সবেগে ছুটোছুটি আরম্ভ করতেন, মুখদিয়ে ফেনা বেতে আরম্ভ করত এবং চোখ দুটো যেন কোটর থেকে ছিটকেবেরিয়ে আসতে চাইত।

হিটলারকে তাঁর অনুচরেরা মিথ্যা সংবাদদিতেন। কারণ যাঁরা সত্য গোপন করেননি, তাঁদের মধ্যে যাঁরা অশেষভাগ্যবান, তাঁরা সুদ্ধু অপমানিত লাঞ্ছিত হয়ে বরখ াস্ত হয়েছেন, অন্যরাকনসেনট্রেশন ক্যাম্পে, কারাগারে ফাঁসি যাচ্ছেন বা হিটলারের খাসসেনানীরচাবুকে চাবুকে জর্জরিত হচ্ছেন।

মূজতবা আলী বলতে ভোলেননি যে যখন মার্কিন - ইংরেজ বোমা বিমান বার্লিনশহরকে ধবংসস্তূপে পরিণত করেছিল, তখন হিটলার কোনোদিন একঘন্টার জন্যও বেরিয়ে এসে তাঁর দেশবাসীর পাশে দাঁড়াননি,পক্ষান্তরে যুদ্ধের গোড়ার দিকে জার্মান বোমা যখন লন্ডন লন্ডভন্ড করছিল তখন প্রায়ই দেখাযেত বিরাট সিগার মুখে চার্চিলসে সব জায়গায় ঘুর বেড়াচ্ছেন আরজনসাধারণকে দুঃখের দিনে উৎসাহ দিচ্ছেন--- আর তারাও বলছে আসুক না তারা।আমরাও আছি গুড্ ওল্ড উইনি।

মুজতবা আলীর এইসব বিবরণ কখনই তাঁকেহিটলারের পক্ষপাতী রূপে নির্দেশ করে না। কিন্তু সর্ব অর্থেই অ -পক্ষপাতী ছিলেন মুজতবা আলী। সে জন্যই তিনি স্পষ্ট লিখে গেছেন যেহিটলার প্রকৃতিস্থ মানুষ ছিলেন না। মানসিক অস্বাভাবিকতার সবলক্ষণই তাঁর মধ্যে ছিল। তাঁর মানসিক অবস্থাকে আরও খারাপের দিকঠেলে দেবার জন্যতাঁর ব্যক্তিগত চিকিৎসক মরেল-এর দায়িত্বও কম ছিল না। মরেলছাড়া আরও কোনো কোনো চিকিৎসক হিটলারের সঙ্গে বাংকারে কিছুক ালকাটিয়েছেন। তাঁদের অনেকেই এবং আরও কেউ কেউ যে সাক্ষ্য দিয়েছেনতা থেকেযা জানা যায় তা লিখে গেছেন মুজতবা আলী---- হিটলার কার্যক্ষমথাক ার জন্যে --- সামান্যতম সর্দিকাশিতে পর্যন্ত ভয় পেতেন, এবং আসারলক্ষণ দেখতে পেলেই অবিচারে ইনজেকশন নিতেন --- মরেলের কাছ থেকেউত্তেজনাদ ায়ক ওষুধ চাইতেন। মরেলও অবিচারে এমন সব ওষুধ আর ইনজেকশনদিতেন যেগুলো দিত সাময়িক উত্তেজনা। কিন্তু আখেরে করত স্বাস্থ্যেরঅশেষ ক্ষতি। বা ঙ্কারে সাময়িকভাবে থাকাকালীন অন্য এক ডাক্তারদৈবযোগে হিটলারের চাকর লিঙের ড্রয়ারে এসব ওষুধ প্রচুর পরিমানে পান ও বিশ্লেষণ করে দেখেন যেওগুলোতে মারাত্মক বিষ রয়েছে. যেগুলো অতি অল্প ডোজ কঠিনব্যামোতে দেওয়া হয়। অথচ মরেল ওগুলো লিঙকে দিয়ে রেখেছিলেন, হুজুর যাতেযখন খুশী ঐসব ট্যাবলেট খেতে পারেন।

আর ইনজেকশনের তো কথাই নেই ঃলেকচার দিতে হলে পূর্বে ইনজেকশন, পরে ইনজেকশন। প্রকৃতিঅসুস্ত মানুষকে সুস্থ হতে সাহায্য করে, মরেল বা হিটলার সে সাহায্যনিতে চাইতেন না। ফলে প্রকৃতির প্রতিশোধও শেষ বয় সেনির্মমভাবে তার প্রাপ্য নেয়।

ডাক্তার যখন হিটলারকে এ তথ্যটি বললেন তখন তিনি রেগে টং ।মরেলের উপর না, ডাক্তারদের উপর।
হিটলার তাঁদের অকথ্য অপমান করেতাড়িয়ে দিলেন। তাঁর বক্তব্য, মরেলের কড়ে আঙুলের যত এলেম এঁদেরগুষ্টির সব কটার মগজেও তা নেই।

হিটলারের চিন্তাধারা যদি অনুসরণকরা যায় তা হলে তিনি যে উন্মাদ ছিলেন তাতে বোধ হয় সন্দেহ থাকে না।কারণ নিজের ও নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে অনড় ধারণা, নির্বিকারে ভিন্নসম্প্রদায়ের মানুষকে কেবল ভিন্ন সম্প্রদায়ের বলেই হত্যা করা, চতুর্দিকে শত্রুএবং ঋিাসঘাতক প্রত্যক্ষ করা, অপরকে হত্যা করব ারঅপ্রতিরোধ্য ইচ্ছা এবংআত্মহনন প্রবৃত্তি--- এসবই উন্মত্ততারলক্ষণ। আত্মহত্যার কয়েক দিন পূর্বে তিনি আদেশ দিয়েছিলেন শত্রু সৈন্য দেখাদেওয়া মাত্র নদীর জলে আটকাবার গেট যেন খুলে দেওয়া হয়। তাতে শত্রু সৈন্যমরত, সেই সঙ্গে মরত হাজার হাজার আহত জার্মান সৈনিক। কিন্তু তাতেভ্রুক্ষেপ ছিল না হিটল ারের। তিনি আদেশ দিয়েছিলেন সামনে শত্রু সৈন্য দেখাদিলে শহরের যাবতীয় কারখানা, বিদ্যুৎকেন্দ্র, সেতু--- সব যেন উড়িয়ে দেওয়াহয়। তাঁর সরবরাহ -মন্ত্রী আপত্তি জানিয়ে বলেছিলেন ----তাহলে যুদ্ধ শেষে জার্মানজাতি আবার নতুন করে দেশ গড়বে কেমন করে ? বাঁচবে কী নিয়ে ? হিটলারের জবাব ছিল---- যুদ্ধে যখনজার্মানরা শ সেনার কাছে হেরেছে তখন তাদের আর বাঁচবার অধিকার নেই। মন্ত্রী কিন্তু এ আদেশ পালন করেননি।হিটলার আদেশ দিয়েছিলেন চারিদিক থেকে অবশিষ্টজার্মানদের সঙ্গিন এবংগুলির মুখে দাঁড় করিয়ে জড়ো হতে বাধ্য করা হোক মধ্য -জার্মানির একটিঅঞ্চলে।সেই স্থানে বা যাওয়া আসার

রাস্তায় থাকবে না কোনো জল বাখাবারের ব্যবস্থা। এ আদেশও পালিত হয়নি। হিটলারের জীবনীলেখকরাবলেছেন— তিনি চেয়েছিলেন তাঁর সঙ্গে বিনষ্ট হয়ে যাক সমগ্র জার্মান জাতি।উন্মত্ততার এর চেয়ে বড়ো প্রমাণ আর কী হতে পারে ?

এসবের পরে নিজের আত্মহত্যারঅভিপ্রায় এবং সম্পাদন খুব স্বাভাবিক বলেই মনে হয়। কিন্তু হিটলারেরজাতি ধবংসের বাসনাটি আমাদের কাছে— বাঙালির কাছে খুব অচেনা লাগে না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কেন ঘটেছিলমন্বন্তর ? জাপানিরা যদি আসে তা হলে তাদের বিপদে ফেলবার জন্য বাঙলারগ্রামে সব সেতু, সব নৌকো ভেঙে দেওয়া, বাজেয়াপ্ত করে নেওয়া সঞ্চিত খাদ্যভান্ডার— বাঙলার গ্রামের কৃষকদেরজীবনধারণের কথা একবিন্দুও না ভেবে সেআদেশ দিয়েছিল যে বা যারা সে তো — হিটলার নয়। সুসভ্য ইংরেজ ! ফ্যাসি বিরোধী মিত্র শক্তি। একথা দাগিয়ে দেননি মুজতবা আলী। এই সমান্তরাল তুলনা এনে দেননি বাঙালির চোখেরসামনে। কিন্তু যার ইতিহাস পড়া আছে তারই মনে পড়বে এই সমান্তরালঘটনা। অথবা আমরা কি বলব হিটলার স্বজাতিকে ধবংস করতে চেয়েছিলেন। আরব্রিটিশ প্রভু অনাহারে মারতে চেয়েছিল উপনিবেশের কালা আদমিদের ! তাই হিটলার অ-মানব আর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মিত্র শক্তি মানব - সভ্যতারত্রাণকর্তা ? এজন্যই সৈয়দ মুজতবা আলীকে বিশ্বেরমানুষ এবং দেশের মানুষ বলে অভিহিত করেছি। তিনি বিদর্পণে স্বদেশকেহারিয়ে ফেলেননি। দেশকে দেখেছেন আরও গভীরভাবে করেছেন প্রকৃতনিরপেক্ষ সহমর্মিতায়।

বার বার সৈয়দ মুজতবা আলীর লেখায় এইপ্রতিন্যাস দেখতে পাই। জাহাজের খালাসি আর সারেঙদের মধ্যে তিনি দেশের মানুষ কে খুঁজে পান বার ব ার।কয়েরোর চা - ব্যাবসায়ী কুর্গপ্রদেশের কোদন্ডমুথহানা হয়ে যান সিলেটি বাঙাল মজবুবার বড়ো ভাই।জার্মান পরিবারের জননীর মধ্যে নিজের মাকে খুঁজে পান তিনি। চাচাকাহিনী-র গল্পগুলিতে জার্মানির ইন্ডিয়া হৌস -এ দেশের বসন্তকেবিন বারবার মুদ্রিত হয়ে যায়।

একবিংশ শতাব্দীতে দেশের মানুষ আরবিশ্বের মানুষের একদিক থেকে যেমন ভেদ থাকবে না, অন্যদিকে রাষ্টিকবৈরিতার বেড়াগুলি থাকবে একই রকম কাঁটা উঁচিয়ে। এক দেশ আর একদেশের উপর বোমা ফেলবে, এক দেশ গুঁড়িয়ে দেবে আর এক দেশের প্রাসাদ। এবং দুই প্রতিবেশী দেশসুচিরকাল চালিয়ে যাবে সীমান্তযুদ্ধ। মানুষের প্রাণ ক্রমশইমূল্যবিহীন হয়ে যাবে রাষ্ট্রশক্তি বৃদ্ধির নেশায়। হিটলার ছড়িয়ে যাবেদেশে দেশে, বহু মানুষের অধিকার আর শক্তিবৃদ্ধির অপ্রতিরোধ্যআকাঙক্ষায়। হিটলারের জীবন নিয়ে নাড়াচাড়া করে এভাবেই সৈয়দমুজতবা আলী দেশ আর বিশ্বের মধ্যে মিল দেখেছিলেন।

সৈয়দ মুজতবা আলীর অনেক রম্য রচনা পড়েছি আমরা। তাঁর এই হিটলারনামের অ-রম্য রচনাটিও তাঁকে চেনবার জন্য অপরিহার্য।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com